[৫২] তারিখ-ই-ফিরুজশাহী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮৫।

ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 06. No. 01. December 2011

খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢার মানবতাবাদী দর্শনঃ একটি পর্যালোচনা

মোঃ মোজাহার আলী*

সারসংক্ষেপঃ সমকালীন দার্শনিক প্রতিভার মধ্যে যে কয়জন ব্যাক্তিত্ব বাংলাদেশ দর্শনে যশস্বী ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢার নাম বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বাংলার নবজাগরণে বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানের নব জাগরণে ছিলেন প্রকৃতার্থে এক রেনেসাঁ-মানব, ঐহিকতা ও পারত্রিকতাকে যিনি এক করতলে মিলিয়ে নিয়েছিলেন, যার মধ্যে ভাষারীতি প্রতিভা ও কারয়িত্রী প্রতিভার সম্মিলন ঘটেছে। স্ব-উদ্যোগে নিজেকে তিনি বিকিয়ে দিয়েছিলেন সমাজ সংস্কারক হিসেবে। তাইতো চিকিৎসা, শিক্ষা সংস্কারসহ বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে এবং সমাজসেবায় নিজেকে আজীবন ব্রত রেখেছিলেন। সর্বপ্রকার কলহ দ্বন্দ্ব, হিংসা-হানাহানি, বিদ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ভুলে গিয়ে তিনি সমাজের মানুষকে মানবতাবাদের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছেন। জীবনজিজ্ঞাসার অন্ড়রালে তাঁর ভিন্নমুখী দর্শনচিন্ড়র ইতিহাস বাংলাদেশ দর্শনরাজ্যে এক শ্রেষ্ঠ উজ্জ্বল নিদর্শন স্বরূপ। তাঁর দর্শনে আমরা দেখতে পাই ধর্ম, নৈতিকতা ও মানবতাবাদসহ নানারকম দর্শন চিন্ড়র সংযোজন। উপমহাদেশের একজন প্রোথিতযশা হিসেবে তাঁর দর্শন আজকে বিশ্বখ্যাত। আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁর মানবতাবাদের দিকটি আলোচিত হয়েছে।

খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢার মানবতাবাদ সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমরা মানবতাবাদ বলতে কি বুঝি- সে সম্পর্কে আলোকপাত প্রয়োজন। সৃষ্টির আঠার হাজার মাখ্লুকাতের মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে পরিগণিত। মানুষ কি, মানুষ কোথা থেকে এল, কোথায় যাবে, কিসে তার কল্যাণ নিহিত এমন অনেক জিজ্ঞাসা। মানুষের জীবনে যা কিছুর প্রয়োজন রয়েছে তাই মানুষের কল্যাণ সাধনে নিহিত। মানুষের কল্যাণের জন্য মানুষের সৃষ্টি। মানুষ তার পরিবেশ, প্রতিবেশ, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, নৈতিকতা সবকিছুর মূল নিয়ন্ত্রক। তার সৃষ্টি কর্মে অপ্রকৃতির কোন স্থান নেই। অলৌকিকতার সবটা তার প্রজাতির নিজস্ব ও লোকায়ত এবং এটাই মানবতাবাদের মূল কথা। গ্রিক দার্শনিক প্রোটোগোরাসকে মানবতাবাদী দর্শনের জনক বলে অভিহিত করা হয়। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "Man is the measure of all things" অর্থাৎ মানুষই সবকিছুর মূল্যায়নের মাপকাঠি।[১] এই উক্তির সত্যতা মানব কল্যাণের মধ্যে নিহিত। মানবকল্যাণে যে মতবাদ তাই মানবতাবাদ। অর্থাৎ যে মতবাদ সর্বদা মানবকল্যাণের কথা বলে তাই মানবতাবাদ হিসেবে পরিচিত। আর কি

* সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, সলুয়া আদর্শ ডিগ্রী কলেজ, চৌগাছা, যশোর।

করে বা কোন উপায়ে মানবের সঠিক কল্যাণ সাধিত হবে এসব বিষয় নিয়ে দর্শনের যে শাখা আলোচনা করে তাকে মানবতাবাদী দর্শন বলা হয়।

আমরা জানি মানবতাবাদ এমন একটি শব্দ যাকে সংজ্ঞায়িত করা খুব কঠিন, কেননা এটা বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। মানবতাবাদ (Humanism) শব্দটি ল্যাটিন শব্দের সাথে সংশিণ্টষ্ট। ল্যাটিন শব্দটি হচ্ছে 'হিউম্যানাস' 'মানবিক' 'হোমো' অর্থ মানুষ এবং 'হোমিসেন' অর্থ 'মানবজাতি'।[২] এভাবে এটা বলা যায় যে এটা হচ্ছে 'মানুষের তত্ত্ব'। কেননা ইহা মানুষ এবং পারিপার্শ্বিকতাসহ তাঁর অস্ড়িত্বের উপর অধিক গুর"ত্ব আরোপ করে। সুতরাং আমরা সহজেই বলতে পারি যে, মানবতাবাদ একটি মানবকেন্দ্রিক মতবাদ।

প্রকৃতপক্ষে বলা যায় 'মানুষ' নামক এক মানবীয় সত্তা থেকে 'মানবতাবাদ' এবং 'মনুষ্যত্ব' শব্দ দুটির উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। যখন মানুষের মাঝে মনুষ্যত্ব প্রকাশ পেতে থাকে তখন তার হৃদয়ে মানবতাবাদের জন্ম নেয়। পশুর জন্মে পাশবিক প্রবৃত্তি। জীবের অংশ হিসেবে মানুষের মাঝে দুটো প্রবৃত্তি বর্তমান-একটি Animality অন্যটি Rationality. মানুষ যখন মানুষের ওপর অত্যাচার-অন্যায় করে, খুন করে তখন পাশবিক প্রবৃত্তি প্রবল হয়, আর যখন Rationality-র প্রাবল্য বাড়ে, তখন তার মাঝে মানবতাবাদের জন্ম নেয় এবং তখন সে দরদী ও অন্যের ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, হিতাহিত জ্ঞান সম্পর্কে সে বুঝতে পারে।[৩]

মানবতাবাদী দর্শন চিন্ড়া বলতে এমন এক জীবন দর্শনকে বুঝায়, যে জীবন দর্শনের মূল বিষয় হচ্ছে মানুষ ও তার কল্যাণ অথবা মানবকল্যাণ। মানুষের উপর মানুষের আধিপত্য বা উৎপীড়ন তথা সকল ধরনের সামাজিক অন্যায় , অবিচার ও অন্যায় ব্যধিসমূহ দূরীকরণের মাধ্যমে সমাজে ন্যায়বোধ ও কল্যাণ দর্শন প্রতিষ্ঠাই এ মতবাদের মূল লক্ষ্য। মানবতাবাদ বলতে তাই মানুষে মানুষে প্রেম মৈত্রী ও ভালবাসার সম্বন্ধকে বুঝায়। মানুষ যাতে কোন অবস্থায় অন্য মানুষকে পীড়ন না করে অথবা তাকে শোষণ না করে এরূপ মনোভাবের দৃষ্টি বুঝায়।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে মানবতাবাদী চিন্ড়ার বিকাশ মোটেই নতুন নয়। খৃষ্টপূর্ব যুগ থেকে শুর" করে আজ পর্যন্ড় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহু কবি, দার্শনিক, সমাজ সংস্কারক, ধর্ম প্রচারক ও রাষ্ট্রনায়ক বিভিন্ন ভাবে মানবতাবাদের প্রচার করে এসেছেন। বর্তমানেও বহু মানবতাবাদী প্রতিষ্ঠান ও আন্ড়র্জাতিক সংস্থাকে মানব কল্যাণের কাজে নিয়োজিত থাকতে দেখা যাচ্ছে। পৃথিবীতে মানুষ এবং পশুর মধ্যের পার্থক্য বিবেকের মাত্রায়। মানবতাবাদীদের মধ্যে বিবেকের প্রাধান্য থাকা অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। মানুষের প্রতি মানুষের সহানুভূতি, সহনশীলতা, মমত্ববোধের কথা বুদ্ধি দিয়ে প্রকাশ হতে পারে। কিন্তু হৃদয়াবেগ ব্যতিরেকে মানবতার সুষ্ঠুরূপ পেতে পারে না। বুদ্ধি মানুষকে হিসেবী করে তোলে। আর মানবতা মানুষকে সকল প্রকার কলহ, দ্বন্দ্ব, ভেদাভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ থেকে দূরে রাখে, সকল মানুষকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে।

সমকালে বাংলাদেশ দর্শনে যে কয়জন প্রোথিতযশা মানবতাবাদী দর্শন বিকাশে অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢার নাম বিশেষভাবে উলেণ্ঢখযোগ্য। তদানীন্ড়ন খুলনা জেলার মহকুমা এবং বর্তমান সাতক্ষীরা জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার নলতা নামক গ্রামে ১৮৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসের কোন এক শনিবারে প্রত্যূষে খানবাহাদুর

আহ্ছানউলণ্ঢা জন্মগ্রহণ করেন।[৪] তাঁর পিতা মুন্সী মোহাম্মদ মফিজউদ্দিন এবং পিতামহ মুন্সী মোহাম্মদ দানেশ ধার্মিক, দানশীল, বিত্তবান এবং সম্ভ্রান্ড় ব্যক্তি ছিলেন।

অবিভক্ত বাংলা ও আসামের শিক্ষা বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা সংস্কারক, দেশবরেণ্য সমাজ সেবক, প্রখ্যাত সাহিত্যিক এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় সুফিসাধক খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা বাঙালি মুসলমানের অহংকার এবং তাঁর কালের আলোকিত মানুষ। শিক্ষাবিভাগের নানা প্রকার উন্নতি সাধন এবং চাকুরী জীবনের প্রশংসনীয় কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তৎকালীন সরকার তাঁকে ১৯১১ সালে "খানবাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করেন। মাত্র ১৫ বৎসর চাকুরী জীবনকালে এই সম্মান লাভ একটি বিরল দৃষ্টান্ড় হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেটের সদস্য নির্বাচিত হন।[৫] তার আগে কোন মুসলমান এই সম্মানসূচক পদ লাভ করেননি। তৎকালীন সাহিত্য-সমাজ ও সাহিত্য সংগঠনের সঙ্গেও তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির ১৯১৭-১৯১৮ সালের কার্যকরী পরিষদের সহ-সভাপতি হিসেবে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সমাজ সেবা, সমাজ সংস্কৃতি বিশেষ করে দীনি প্রচার কার্যে অবিস্মরণীয় অবদানের জন্যে তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পুরস্কার ১৪০৫ হিঃ (মরণোত্তর) এ ভূষিত হন। বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট ও বহুমূখী দানের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলা একাডেমী তাঁকে ১৯৬০ সালে সম্মানসূচক ফেলোশীপ প্রদান করে।

খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা দীর্ঘ পরমায়ু ছিলেন। জীবনের প্রায় পুরোটা সময় তিনি অনগ্রসর মুসলিম জাতির উন্নতির জন্য ব্যয় করেছেন। ইংরেজ শাসনাধীনে মুসলমানদের যে ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গির যে পশ্চাদপদতা, সংস্কৃতিক যে অবক্ষয়, তাতে নতুন জীবন দৃষ্টি ও বিশ্ববিক্ষা নির্মাণে তিনি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। তিনি তাঁর উদ্যোগে ও কর্ম প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে মুসলমান জীবন ও মানসে যে শ্রেয় চেতনা নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন তাতে তিনি পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেন। তাঁর জীবদ্দশায় ষাটটির মত বই রচনা করেন- যার প্রত্যেকটি বইতে আছে মুসলিম জাতির ধর্ম, নৈতিকতা, মানবতাবাদের দিক নির্দেশনার পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়াবলী।

খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা ছিলেন সাম্প্রতিককালের মুসলিম মনীষীদের মধ্যে একজন সংস্কারধর্মী মানবতাবাদী চিন্ড়াবিদ। তিনি পরিচ্ছন্ন চিন্ড়া, সাবলীল রচনা ও উদার হৃদয়ের অধিকারী এক মানব প্রেমিক। সর্বদা মানুষের কল্যাণ ও মুক্তির পথ প্রদর্শনই তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর দর্শন সাহিত্য ভাবনায় প্রায় পুরোটা দখল করে আছে স্বদেশ ও স্ব-জাতি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-দর্শন এবং মানুষের সার্বিক মঙ্গল কামনা। তিনি বলেন, "সমাজ-সেবাই সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। তিনি আরোও বলেন, যে জাতির সাহিত্য নাই সে জাতির আত্মসম্মান নাই, সে জাতির উন্নতি সুদূর পরাহত। যদি মোছলেম বলিয়া পরিচয় দিতে হয়, যদি অন্য জাতির সমকক্ষতা অর্জন করিতে হয়, তবে মাতৃভাষাকে জাতীয়ভাবে ভাবাপন্ন করিতে হইবে। জাতীয় অস্ড়িত্ব রক্ষা করিতে হইলে বাঙলা ভাষার উন্নতি একান্ড় আবশ্যক।" সমাজসেবা, জাতীয় উন্নয়ন এবং মানুষের চারিত্রিক উন্নতির লক্ষ্যে খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা বেশকিছু জীবনীমূলক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এবং বিভিন্ন সূফী সাধকদের জীবনী ছাড়াও রাষ্টনায়ক ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের জীবনী রচনা করেন।

উপমহাদেশের একজন খ্যাতিমান নামকরা ব্যক্তিত্ব ছিলেন খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা। একজন নির্ভীক পূণ্যবান সমাজ হিতৈষী সংস্কারক হিসেবে নৈতিক অবক্ষয় থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য তিনি স্ববিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। মানবের কল্যাণার্থে তিনি আজীবন কাজ করেছেন। তিনি বলেন, মানবতার বাণীকে কাজে লাগাতে হলে চাই শিক্ষা, এমন কার্যকর শিক্ষা, যা-নিজেকে সীমিত রাখে না, আক্ষরিক জ্ঞানের ভূবনে, বরং রূপান্ড়রিত করে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রকে।[৬] তাঁর মতে, যে শিক্ষা দ্বারা বান্দা স্বীয় র"হানী শক্তিকে বর্ধিত করে স্রষ্টার নজদিগি লাভ করতে পারে এবং যা দ্বারা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে খোদার বান্দাকে সারা প্রাণটি দিয়ে খেদমত করতে পারে সেই শিক্ষাই অন্যতম শিক্ষা।[৭] আর এর জন্য প্রয়োজন প্রেম। প্রেম দিয়েই মানুষ জয় করে প্রবৃত্তিকে এবং অগ্রসর হয় বিকাশের উচ্চ থেকে উচ্চতর সোপানে। কেননা প্রেম মানুষকে সর্বপ্রকার পাপাসক্তি, মলিনতা, হিংসা-দ্বন্দ্ব থেকে মানুষকে দূরে রাখে। প্রেম মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য সৃষ্টি করে, সম্প্রীতি গড়ে তোলে, একজন অপর একজনকে চিনতে পারে, জানতে পারে প্রেমের মাধ্যমে। যে ব্যক্তির ভেতর প্রেম বা ভালবাসা আছে তার দ্বারা অপরের ক্ষতি সাধন হয় না।[৮]

খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ' করে স্বদেশবাসীর 'র"হানী খেদমত' এবং 'সমাজ সেবায় ও বাঙালি মুসলমানদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য ১৯৩৫ সালের ১৫ই মার্চ প্রতিষ্ঠিত করেন 'আহ্ছানিয়া মিশন' নামে একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। এই আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয় নলতা (কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশন) সাতক্ষীরা জেলার নলতা শরীফে অবস্থিত। বর্তমানে দেশ-বিদেশে আহ্ছানিয়া মিশনের ১১৭ টি শাখা মিশন রয়েছে। এসকল শাখা মিশনের মধ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কার্যক্রম জনমনে বিপুল প্রভাব বিস্ড়ার করেছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, দারিদ্র বিমোচন, আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসংস্থান, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, স্যানিটেশন, বৃক্ষরোপণ, গৃহসংস্থান, কারিগরি শিক্ষা, সার্বিক সমাজ উন্নয়ন, শিক্ষা উপকরণ তৈরী, গণশিক্ষা উন্নয়ন, শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ, গ্রন্থ উন্নয়ন ও বন্টন, বস্ড়ি এলাকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন এতদসম্পর্কিত গবেষণা, জরিপ ও মূল্যায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দৃষ্টান্ড় উপস্থাপন করেছে। মিশন ইতোমধ্যে আহ্ছানউলণ্ঢা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, আহ্ছানউলণ্ঢা ইনষ্টিটিউট অফ ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনলজি, ভকেশনাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউশন ফর ওয়ার্কিং চিল্ড্রেন, আহ্ছানিয়া মিশন বুক ডিষ্ট্রিবিউশন হাউজ, আহ্ছানিয়া মিশন ইনষ্টিটিউট অফ হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। চিকিৎসা সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ ও জেনারেল হাসপাতালসহ অনেক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। তাছাড়া ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সৌহার্দ্য কর্মসূচী নামক প্রতিষ্ঠান দেশ ও দশের খেদমতের সেবায় সার্বক্ষণিক নিয়োজিত রয়েছে।[৯]

আহ্ছানিয়া মিশন মূলত খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢার বিশ্বাস, আদর্শ এবং অন্ড়র্গত সৌন্দর্য্যের বহিঃপ্রকাশ। মিশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তিনি স্থির করেন স্রষ্টার ইবাদত ও সৃষ্টের সেবা। সেবাই ছিল তাঁর জীবনের একটি উলেণ্ঢখযোগ্য দিক। এ সম্পর্কে তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি বলেন, "শহর থেকে দূরে সরিয়া মানবের খেদমত করাই আমি জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করিয়াছি। খেদমতে যে আনন্দ, মখদুমিয়াতে আর নেই। আমিত্ব

দূরীভূত না হইলে মহব্বতের প্রসার হয় না। সৃষ্টির প্রতি প্রেম না জন্মিলে স্রষ্টার প্রতি প্রেম হয় না। ভ্রাতৃত্ব বিস্ড়ার ও তৎসহ শান্ড়ি সৃষ্টি মদীয় জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।[১০]

তাঁর মতে, জনসাধারণের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিতে হইলে সম্যকরূপে শিক্ষা বিস্ড়ার প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যতীত বর্তমান যুগের জটিলতার মধ্যে জীবন সংগ্রামে মোটামুটিভাবে সাফল্য লাভ করাও সম্ভবপর নহে। তাই আমরা দেখতে পাই যে, এ মিশনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা, ঈর্ষা, দ্বেষ, অহংকার ও হিংসাবৃত্তির দমন এবং আত্মিক শক্তির সম্প্রসারণ, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন, দুঃখমোচন এবং পলণ্ঢী উন্নয়ন করা। এক কথায় খোদার এবাদত বান্দার খেদমত-এর লক্ষ্যেই স্থাপিত হয়েছে এ মিশন।

কোন বিশেষ জাতি, ধর্ম কিংবা বর্ণের নয়, সারা পৃথিবীর মানুষকে সমান জ্ঞান দান করে সকলের সেবায় অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছিল এ মিশনের ঘোষণায় তথা সার্বিকভাবে মানুষের মঙ্গলার্থে কাজ করে যাওয়া। উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সর্বাধিক গুর"ত্ব আরোপ করে তিনি বলেন, ধর্মে বিধৃত প্রেম ও মানবতার বাণীকে কাজে লাগাতে হলে চাই শিক্ষা এবং প্রেম। শুর"তে আত্মসুখে মগ্ন মানুষই ধীরে ধীরে প্রবৃত্ত হয় সমাজ সেবা, দেশ সেবা, মানব সেবা ও জগৎ সেবায়। এভাবে সাধনার চূড়ান্ড় পর্যায়ে সে উপলব্ধি করে প্রেমময় স্রষ্টার একত্ব। সমগ্র জগতে প্রেমের এই মহাকর্ষণ যিনি উপলব্ধি করেন তিনি জীবে জীবে, মানুষে মানুষে জাত-বর্ণ-ছোট-বড় ইত্যাদি কোন ভেদাভেদ দেখতে পান না, সবকিছুতে তিনি প্রত্যক্ষ করেন প্রেমময়ের উপস্থিতি। সাধনার এ স্ড়রে উপনীত হয়ে যান। তাই খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা বলেন-

আমি মানুষে মানুষে পার্থক্য জানি না।
শ্বেতকায়, কৃষ্ণকায়ে প্রভেদ দেখিনা, ছোট বড়
বুঝি না,সবাই শক্তিময় দয়াময় প্রেমময়
স্রষ্টার সৃষ্টি।[১১]

খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। তিনি কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-বিদ্বেষ, ভেদাভেদ পছন্দ করতেন না। ভাষার ব্যবচ্ছেদে যে জাতির ব্যবচ্ছেদ ঘটবে এ বিষয়ে তিনি কখনও একমত পোষণ করেননি। বাংলা ভাষার স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার ও অসাম্প্রদায়িক। তাঁর মতে, ভাষার পরিচর্যা তথা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে উদার খোলা মন নিয়ে এবং ভাষাকে রাখতে হবে দেশ, কাল ও জাতির সংকীর্ণ মতবিরোধ ও স্বার্থ সিদ্ধির উর্ধ্বে। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিম্নোক্ত উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য।

"কেহ কেহ বলেছেন যে, হিন্দু-মুসলমানদিগের জন্য স্বতন্ত্র বঙ্গভাষা, আবার কেহ কেহ বলেছেন পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গের জন্য স্বতন্ত্র ভাষা হওয়া আবশ্যক। বঙ্গের ব্যবচ্ছেদ হইয়াছে বটে, কিন্তু বঙ্গভাষার ব্যবচ্ছেদ হয় নাই। জাতি ও বর্ণভেদ অনুসারে ভাষার ভেদ হওয়া অযৌক্তিক।"[১২]

তিনি ছিলেন মুক্ত চিন্ড়ার অধিকারী। উদার মুক্ত মন নিয়ে তাঁর মানবতাবাদী দর্শন রচনা করেছেন। জীবন সমুদ্রের পাতায় দেখা যায় তিনি তাঁর প্রগতিশীল মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তৎকালীন জড়তাগ্রস্ড় মুসলমানদের কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস বেড়াজাল থেকে মুক্ত

করেন এবং মুসলিম নবজাগরণের সংঘটন ঘটান। সমগ্র উপমহাদেশের মধ্যে ভারতের রামকৃষ্ণ মিশন হল একটি বিখ্যাত সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। এই মিশন, আর্ত, পীড়িত ও দুঃস্থদের মানবতা সেবায় সার্বক্ষণিক নিয়োজিত। তিনি ভারতে অবস্থানকালে এই রামকৃষ্ণ মিশনের অনুপ্রেরণায় পরবর্তীতে বাংলাদেশে আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, 'দুঃস্থের সেবা করাই উক্ত মিশনের (রামকৃষ্ণ মিশনের) লক্ষ্য। ইহার দ্বারা কত স্থানে হাসপাতাল, শিক্ষা মন্দির, পান্থশালা প্রস্তুত হইতেছে, আর আমরা নিজের সেবায় দিবারাত্রি ব্যস্ড়। মোছলেম সমাজে এই অভাব দেখিয়া আহ্ছানিয়া মিশন গঠন করা হয়েছে।'[১৩] বর্তমানে এই মিশন দেশ-বিদেশে শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে নানা রকম মানব সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে।

খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢার জীবন দর্শনের একটি উলেণ্ঢখযোগ্য দিক হল সেবা, ধর্ম ও সর্বজনীন মানবতাবাদ। আর এসবের প্রয়োগ ও সার্থক অনুশীলনের জন্য তিনি জীবদ্দশায় প্রতিষ্ঠা করেন এই আহ্ছানিয়া মিশন ও ট্রাস্ট। এছাড়া তাঁর নামে ঢাকাতে আহ্ছান মঞ্জিল যাদুঘর ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন নামে ক্যান্সার ইনষ্টিটিউট, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজসহ বহু সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এর মাধ্যমে সমাজের সকল প্রকার মানুষের মঙ্গল সাধিত হচ্ছে। জাতিতে মুসলমান হওয়া সত্বেও তিনি কেবল মুসলমানদের উন্নতি নয়, সব সম্প্রদায়ের মানুষ যেন সমানভাবে উন্নত হয়ে জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধ ও সুসংহত করতে পারে তা কামনা করেছেন। তিনি মনে করেন, একটি গাছ যেমন তার ছায়াতলে যে কোন মানুষ বা জীবকে আশ্রয় দেয়, তেমনি প্রত্যেকটি মানুষের উচিৎ ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সব মানুষকে ভাই ভাই করে আলিঙ্গন করা এবং দুঃসময় ও অসহায় অবস্থায় তার পাশে থেকে সেবা করা। তাই দেখা যায় মূল্যবোধপুষ্ট তাঁর এ মহৎ জীবন দর্শন বর্তমান সমকালীন দুঃস্থ সমাজে বিশেষ অনুপ্রেরণার উৎস। আর এ ধরনের মূল্যবোধপুষ্ট মানবোচিত জীবন দর্শনের লক্ষেই তিনি তাঁর সমগ্র ধ্যান-ধারণা, সাহিত্যকর্ম, দর্শন ও সমগ্র জীবন সাধনাকে উৎসর্গ করেছেন।

তৎকালে শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজের যে অনগ্রসরতা সে বিষয়ে খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা তৎপর ছিলেন। শুধু তাই নয় শিক্ষা জীবনে মুসলমান ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা তাঁকে বিচলিত করে। শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন গুর"ত্বপূর্ণ পদে চাকুরী করার সময় তিনি মুসলমান ছাত্রদের উপর্যুক্ত সমস্যা সমাধানে সর্বদা সচেষ্ট থেকেছেন। তিনি রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের সুপারনিউমারী টিচার্স নিযুক্ত হন।[১৪] এছাড়া ফরিদপুরে অতিরিক্ত ডেপুটি ইন্সপেক্টর, স্কুল সাব ইন্সপেক্টর, বাখেরগঞ্জ জেলায় ডেপুটি ইন্সপেক্টর সহ বিভিন্ন গুনুত্বপূর্ণ পদে চাকুরী করেন। শিক্ষা বিভাগেই তাঁর সমগ্র চাকুরী জীবন অতিবাহিত হয়েছে। চাকুরীর শেষ পর্যায়ে এই বিভাগের উচ্চতর পদে উন্নীত হয়ে তিনি তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাকে আরো সুন্দর ও সুচার"র"পে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ সময়ে তাঁর সক্রিয় হস্ড়ক্ষেপের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে তথা মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপুল সংস্কার সাধিত হয়।

রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে হেডমাস্টার পদে শিক্ষকতা করার সময় তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে হিন্দু ছাত্রছাত্রীদের আবাসন সুবিধা থাকলেও মুসলমান ছাত্রদের নাই। যদিও সে সময়ে রাজশাহীতে নাটোর মহারাজার পক্ষ থেকে হিন্দু ছাত্রাবাস তৈরী করা হয় কিন্তু মুসলমান ছাত্রদের জন্য কোন ছাত্রাবাস ছিল না। তাই তিনি মুসলমান ছাত্রদের জন্য একটি

ছাত্রাবাস নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ সময়কার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, "আমি রাজশাহী জেলার বিভিন্ন স্থানে জনসাধারণকে আহবান করিয়া ভিক্ষার প্রস্ড়াব করি। কত দিবা, কত রাত্রি বৃক্ষতলে একাকী যাপন করিতে হইয়াছে। যাহা হউক, সহৃদয় ব্যক্তিগণ আমাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। এইরূপে প্রায় সহস্রাধিক টাকা সংগৃহীত হইল।"[১৫] মজার বিষয় হল তিনি মুসলিম ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্য থেমে থাকেননি। বিভিন্ন রকম ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে এ কাজটি তিনি সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন। দেখা যায় যে, শুধুমাত্র ভিক্ষার অর্থে একটি ছাত্রাবাস নির্মাণ এমন দুঃসাহস ও আন্ড়রিক প্রচেষ্টা আজকের সমাজে বিরল।

তাই ছাত্রাবাস নির্মাণে তাঁর অদম্য চেতনা কাজ করেছে। আমরা দেখতে পাই যে, সেসময়ে পূর্ববঙ্গ ও আসামের ছোটলাট স্যার বামফিল্ড ফুলার রাজশাহী পরিদর্শনে আসেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা এ সুযোগে ছোটলাট বাহাদুরকে অভ্যর্থনা দিয়ে মুসলমান ছাত্রদের হোস্টেলের অসুবিধার কথা নিবেদন করার ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি তাঁর এই পরিকল্পনা ব্যর্থ করার জন্য বিভিন্ন হীন প্রচেষ্টা অবলম্বন করে। ছোট লাট বাহাদুরের অভ্যর্থনার জন্য যে তোরণ তৈরী করা হয় তা পুড়িয়ে দেয়। রাজশাহী অধিকাংশ ছাপাখানার মালিক অভিনন্দন পত্র ছাপাতে রাজী হয়নি। তিনি গোপনে কলকাতায় লোক পাঠিয়ে অভিনন্দন পত্র ছাপিয়ে আনার ব্যবস্থা করেন। স্থানীয় কলেজ পরিদর্শন করে ছোটলাট বাহাদুর কলেজিয়েট স্কুলে আসলে খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা 'মোসলেম হোস্টেলের' অভাবের কথা নিবেদন করেন। প্রিন্সিপাল এ প্রস্ড়াবে আপত্তি করে বলেন, রাজশাহীতে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়। অতএব প্রচুর অর্থ ব্যয় করে ইটের তৈরী হোস্টেল তৈরী করলে তা ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। টাকার অপচয় হবে। খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা অত্যন্ড় ধীর এবং শান্ড়ভাবে এর জবাবে বলেন, "রাজশাহী কলেজটি যদি ইটের তৈরী হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিন যাবৎ ভূমিকম্পের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে থাকে তাহলে মুসলিম হোস্টেলও রক্ষা পাবে এবং আমি কলেজের মত একটি হোস্টেল পেলেই খুশী। এর চেয়ে বড় আমি চাই না। ছোট লাট বাহাদুর একজন ন্যায়পরায়ণ ও বিচক্ষণ ইংরেজ অফিসার ছিলেন এবং সহজেই অবগত হলেন বিষয়টি। সন্ধ্যায় তিনি তাঁর লঞ্চে একটি সভা ডাকলেন এবং সেখানেই মুসলিম হোস্টেল তৈরী করার জন্য একটি নক্সা এবং পঁচাত্তর হাজার টাকা অনুমোদন করেন। দু'তলা বিরাট মুসলিম হোস্টেল তৈরী হল মুসলমান ছাত্রদের জন্য। ছোট লাট বাহাদুরের স্মৃতি রক্ষার্থে এবং তাঁর নাম অনুসারে এ হোস্টেলের নামকরণ করা হয় "ফুলার হোস্টেল"।[১৬] এখানে খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢার অবদান চিরস্মরণীয়। তৎসময়ে তিনি মুসলিম ছাত্রদের আবাসনের সুবিধা করে মানবতার এক মহান গৌরব অর্জন করেন।

শিক্ষা বিভাগের সংস্কার সাধনে খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢার অবদান অপরিসীম ছিল। তিনি অনেক বাক-বিত"া, বাদ-প্রতিবাদ ও নানা প্রতিকুল অবস্থার মধ্য দিয়ে শিক্ষা বিভাগের প্রভূত সংস্কার সাধন করেন। তৎকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার্থীর নাম লেখার রীতি প্রচলিত ছিল। অনেকেরই ধারণা ছিল যে, হিন্দু ও মোছলেম পরীক্ষার্থীর মধ্যে পক্ষপাতিত্ব হওয়ার সুযোগ থাকে। তজ্জন্য কোন পরীক্ষায় মোছলেম ছাত্র উচ্চস্থান অধিকার করতে পারে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম পরীক্ষার্থী ১ম, ২য়, ৩য় স্থান অধিকার করতে পারে, আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেউ সহজে প্রথম বিভাগেও স্থান পায়

না। সাম্প্রদায়িক মনোভাব এর পশ্চাতে রয়েছে বলে অনেকে ধারণা করতেন। এ প্রসঙ্গে খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, যাহা হউক ভারতে যত বিশ্ববিদ্যালয় আছে, আমি সকল স্থান হইতে তথ্য সংগ্রহ করিলাম। প্রায় সর্বত্রই দৃষ্ট হইল, উত্তরের খাতায় কোথাও পরীক্ষার্থীর নাম লেখার রীতি নাই। কেবল পরীক্ষার্থীর ক্রমিক নং (Roll Number) দেওয়া হয়। এ লইয়া আমি তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিলাম এবং কতিপয় নিরপেক্ষ মেম্বরের সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ হইলাম। বিরোধী পক্ষ এই বলিয়া আপত্তি করিলেন যে, খাতায় পরীক্ষার্থীর নাম না থাকিলে শুধু ক্রমিক নম্বর দ্বারা কাজ চলিতে পারে না। ইহাতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। আমরা তদুত্তরে বলিলাম যে, বর্তমানে অনার্স, এম.এ পরীক্ষায় ছাত্র সংখ্যা খুব কম। সুতরাং পরীক্ষামূলকভাবে অন্ড়ত এই পরীক্ষায় নামের পরিবর্তে ক্রমিক নাম্বার দেওয়ার বিধি প্রবর্ত্তন করা হউক।'[১৭] বহু বাক-বিতণ্ডার পর নামের পরিবর্তে পরীক্ষার খাতায় রোল নম্বর লেখার রীতি প্রবর্তনের স্বপক্ষে খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢার বিশেষ উদ্যোগ গৃহীত হয় এবং সর্বপ্রথম অনার্স ও এম.এ পরীক্ষায় এ নীতি প্রবর্ত্তনে তিনি সক্ষম হন। এই নীতি প্রর্বনের ফলে কোন অসুবিধা দৃষ্ট হইল না বরং মুসলিম পরীক্ষার্থীর মধ্য থেকে তৎকালীন সময়ে কেহ কেহ উচ্চস্থান অধিকার করতে শুরু করল।

এরপর এই অনুকরণে আই.এ এবং বি.এ পরীক্ষার পরীক্ষার্থীর খাতায় নাম লেখা বন্ধ করে রোল নম্বর লেখার নিয়ম প্রবর্তন করেন তিনি। যদিও ম্যাট্রিক পরীক্ষায় নামের পরিবর্তে রোল নম্বর লেখার রীতি বিলম্ব হয় তবুও কালাদিক্রমে এটি বাস্ড়বায়ন হয় এবং পর্যায়ক্রমে চাকুরী-বাকরী সকল পরীক্ষায় রোল নম্বর লেখার রীতি প্রচলিত হয়। এসব কিছুর পেছনে খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢার অবদান ছিল অপরিসীম।

সেকালে কলকাতায় মুসলিম ছাত্রদের পড়াশোনা করার জন্য কোন স্বতন্ত্র কলেজ ছিল না। তাঁর স্বউদ্যোগে কলকাতার মুসলমানদের জন্য কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়। এ প্রসঙ্গে তাঁর যে ভূমিকা ছিল তা তাঁর বক্তব্যে প্রমাণিত হয়:

> কলিকাতায় মুসলিম ছাত্রদিগের জন্য একটি স্বতন্ত্র কলেজ স্থাপন করিবার প্রস্ড়াব হয়। উক্ত প্রস্ড়াব সমর্থন করিবার ভার আমার উপর ন্যস্ড় হয়। হিন্দু সদস্যগণ ইহার বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করেন। আমি বলিলাম-হিন্দুদের জন্য সংস্কৃতি কলেজের যদি আবশ্যকতা থাকে, তবে মুসলিম কলেজের আবশ্যকতা নিশ্চয় আছে, ব্যয় গভর্ণমেন্ট বহন করিবেন, সুতরাং আপত্তির কারণ অগ্রাহ্য হইল। প্রস্ড়াবিত মুসলিম কলেজে আরবী, ফারসী ও উর্দু শিক্ষার বৈশিষ্ট্য থাকিবে। ইসলামিক ঐতিহ্য, ইসলামিক আচার, বাধ্যতামূলক নামাজ ও ইসলামিক পারিপার্শ্বিকতা গঠন এই কলেজের অন্যতম উদ্দেশ্য হইবে। এই প্রস্ড়াবে কেহ আপত্তি করিতে পারেন নাই। তবে অন্য পক্ষ মত প্রকাশ করেছিলেন, যে পর্যন্ড় মুসলিম শিক্ষার্থীর সংখ্যা আশানুরূপ না হইবে, ততদিন হিন্দু ছাত্র ইচ্ছা করিলে মোছলেম কলেজে ভর্তি হইতে পারিবে। ইহাতে আমরা সম্মতি জানাইলে প্রস্ড়াবটি গৃহীত হয়। ফলে কিছুদিনের মধ্যে স্বতন্ত্র ইছলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। কলিকাতা মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল Mr. Harley এই কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হইলেন। কলেজ খুলিতেই প্রচুর মোছলেম ছাত্রের সমাবেশ হয়, সুতরাং হিন্দু ছাত্রের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থার আবশ্যক হয় নাই।[১৮]

তাঁর প্রচেষ্টায় বহু মক্তব, মাদ্রাসা, মুসলিম হাইস্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অনেক মুসলমান শিক্ষকের কর্মসংস্থান হয়। কলিকাতার বুকে প্রতিষ্ঠিত বেকার হোষ্টেল, টেলার হোষ্টেল, কারমাইকেল হোষ্টেল, মোছলেম ইনষ্টিটিউট প্রভৃতি তাঁর অবদানের সাক্ষ্য বহন করে। তিনি স্বতন্ত্র মক্তব পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করেন এবং মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষার জন্য মুসলমান লেখকগণ পাঠ্যপুস্ড়ক লেখার সুযোগ পান এবং মুসলমান পুস্ড়ক-প্রকাশকগণের অবস্থার উন্নতি হয়। তৎকালীন মখদুমী লাইব্রেরী, প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ইসলামিয়া লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা এবং তা টিকে থাকার পেছনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। স্কুল, কলেজে মুসলমান ছাত্রদের বৃত্তির আনুপাতিক সংখ্যা তিনি নির্ধারণ করেন এবং গরীব মেধাবী ছাত্রদের বর্ধিত হারে বিনা বেতনে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। বৈদেশিক উচ্চ শিক্ষার জন্য মুসলমানদের সরকারী বৃত্তি প্রাপ্তির পথও তিনি সুগম করেন।

খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা পাঠ্যসূচীর অন্ড়র্ভূক্ত টেক্সট বুক কমিটিতে মুসলমান সদস্য নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করেন এবং পরীক্ষার্থীদের মধ্যে মুসলমান পরীক্ষকের সংখ্যা, শিক্ষা বিভাগের পরিদর্শক, কর্মচারীদের মধ্যে মুসলমান কর্মচারীর সংখ্যা নির্ধারণ, ট্রেনিং কলেজে মুসলমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা, স্কুল কলেজের ম্যানেজিং কমিটির মধ্যে মুসলমান আসন সংখ্যা নির্ধারণ করেন এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় এগুলো সফলতার দ্বারে উপনীত হয়। তাঁর মাধ্যমে নিউস্কিম মাদ্রাসার সৃষ্টি হয় এবং আরবী শিক্ষার মধ্যস্থতায় ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। তাঁর সুদৃঢ়তার কারণে হাইস্কুলে আরবী অধিকতরভাবে সেকেন্ড ল্যাংগুয়েজ রূপে স্থান পায়। শুধু তাই নয় তিনি মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্য বিশেষ বিশেষ স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাদের শিক্ষা ও শিল্পের বিস্ড়ার কল্পে অনুকূল পরিবেশ ও সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেন।

তৎকালে মুসলিম শিক্ষার উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য অবিভক্ত বাংলার গভর্ণর ১৯১৪ সালের ৩০শে জুন ২৪৭৮ সংখ্যক রেজিউলেশনে মুসলিম শিক্ষার উন্নতি কল্পে তিনটি বিশেষ ধারার স্বপক্ষে সুপারিশ করার জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করেন। প্রাদেশিক পরিষদের ডিরেক্টর হর্নেল এই কমিটির সভাপতি এবং খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা ছিলেন এই কমিটির অন্যতম সদস্য। উক্ত কমিটির সুপারিশ মুসলিম শিক্ষার উন্নতি ও অগ্রগতিতে একটি সুদূর প্রসারী অবদান রাখতে সক্ষম হয়। যার ফলে দিন দিন মুসলিম শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। শুধু তাই নয় তখনকার সময়ে পূর্ববঙ্গে শিক্ষাবিষয়ক যত কমিটি গঠিত বা কনফারেন্স হত তাঁর সবকটিতে খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা সদস্য বা অন্য কোন পদাধিকার বলে জড়িত থাকতেন।

বাংলাদেশের বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় ও আন্ড়র্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত বলে পরিগণিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢার ভূমিকা ব্যাপক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া বিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে উপস্থাপিত হলে দারুণ বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং পরে একটি বিবেচনার জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়। তিনি এই কমিটির অন্যতম সদস্য হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা জোরালোভাবে সমর্থন করেন। এক্ষেত্রে তাঁর সক্রিয় অবদান অনস্বীকার্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ে তখনকার সময়ে মুসলমান কর্মচারীদের নিয়োগ দেয়া হত না। খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা তৎসময়ে পাঁচ বৎসর যাবৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে জড়িত থাকার সুযোগ

পান। এই সময়ের মধ্যে তিনি তাঁর ক্ষুদ্র শক্তি প্রয়োগ করেন মুসলিম শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে। তিনি নিবেদিতভাবে নিয়োজিত ছিলেন উদার মনোভাবাপন্নে। যার ফলে বহু মুসলিম শিক্ষক ও কর্মচারী শিক্ষা বিভাগে কর্মের সুযোগ পান। আজীবন তিনি মানবতার সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। সর্বদাই তিনি সমাজের মানুষের খেদমত করতেন। তাই আজীবন মানুষের খেদমতের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন:

> মুসিলম সমাজের খেদমতের জন্য যে সুযোগ আমি পাইয়াছিলাম তজ্জন্য পরম করুণাময় খোদাতালাকে সর্বদা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। জীবনের শেষ ভাগটুকু যদি মানব-জগতের সেবা করিবার সুযোগ পাই তবে স্বীয় জীবনকে ধন্য মনে করিব। কেবল অর্থকরী বিদ্যাদ্বারা জীবন-সমস্যার সমাধান হয় না। আধ্যাত্মিক শিক্ষার আবশ্যক। কেবল অর্থ মানুষকে উন্নত করিতে পারে না। আত্মার উন্নতিই প্রকৃত উন্নতি। মানবতাই জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পাইতেছে বহু লোক, কিন্তু মানুষ তৈরী হইতেছে কয়টা?[১৯]

রাজশাহীতে কোন সময় ডিষ্ট্রিক বোর্ডের চেয়ারম্যান মুসলমান হতে পারতো না। খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা যখন রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে চাকুরী করতেন তখন তাঁরই ঐকান্ড়িক প্রচেষ্টার ফলে সর্বপ্রথম মোহাম্মদ এমাদ উদ্দিন আহম্মদ বি.এল মুসলিম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন রাজশাহী ডিষ্ট্রিক বোর্ডে। এর ফলে তাঁর ওপর হিন্দু সমাজের ব্যক্তি বিশেষের বিদ্বেষ ভাব দৃষ্ট হয়, কিন্তু কালক্রমে উক্ত ভাব তিরোহিত হয়।[২০] তিনি মুসলমানদের অগ্রগতিসহ সমগ্র বিশ্বের মানুষের সর্বদা সুখশান্ড়ি ও কল্যাণময় জীবন কামনা করেছেন। জাতির সাথে জাতির, দেশের সাথে দেশের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে যেন হানাহানি না থাকে, সবাই যেন সহযোগিতা, সমঝোতা, সহমর্মিতা ও বন্ধুত্বের পরিবেশে মহৎ মানবোচিত জীবনের চর্চা ও অনুশীলন করিতে পারে, এটাই তিনি কামনা করেন। তাঁর এই আন্ড়রিক আশার অভিব্যক্তি লক্ষ্য করি এই উক্তিতে- "আবার পৃথিবী জ্ঞানগর্ভে গর্বিত হউক... আবার বিদ্বেষ, কলহ, পরশ্রীকাতরতা চিরতরে বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত হউক, আবার প্রকৃতি হাসুক, পাপ কালিমা পূণ্যের আলোকে বিদূরিত হউক, অসত্যের স্থলে সত্য সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হউক... সকল ধর্ম সকল জাতি একযোগে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া সারা পৃথিবীর উন্নতি সাধনে ব্রতী হউক।"[২১]

নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা চাকুরী জীবন প্রবাহিত করেন। তবুও এই সময়ে তিনি মুসলিম জাতির জাগরণের জন্য অনেক কিছু করে গেছেন। সর্বদা তিনি ছিলেন কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিত্ব। কাজ এবং সেবাই ছিল তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য। হিন্দু, মুসলমান সবাই তাকে ভক্তি করত। তৎসময়ে রাজশাহীতে মুসলমানদের মধ্যে একতার বড় অভাব দেখা দিলে এবং দলগত বিদ্বেষ ও মতানৈক্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে সৃষ্টি হলে তিনি এ সমস্যা নিরসনের জন্য মুসলমান সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রক্ষা করে, তাদের সংগে আলাপ-আলোচনা করে পলণ্ঢীতে পলণ্ঢীতে সভা ডেকে মুসলমানদের মধ্যে একতা ও সৌহার্দ্য ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন।

পরিশেষে বলা যায় যে, মানবসেবক হিসেবে খ্যাত খানবাহাদুর আহ্ছানউলণ্ঢা ছিলেন একজন সমাজ হিতৈষী সংস্কারক। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় অনেক প্রকার সেবামূলক সামাজিক কর্মকান্ড়ের সংগে জড়িত ছিলেন। সমাজের মাঝে হানাহানি, বিশৃঙ্খলা, মানুষ হত্যা, তিক্ততা, সংঘর্ষ, হিংসা বিদ্বেষ, অনৈক্য, সংকীর্ণতা ইত্যাদিকে তিনি কখনও পছন্দ করতেন